নানা রঙের দিনগুলি (Vivid days gone by)

- আরতি মিত্র (Arati Mitra), পত্নী (Wife)

একসাথে চলার শুরু সন 1962 থেকে। বিয়ের পরের কয়েক মাস আঁটপুর গ্রামে কাটিয়ে চাকুরী ক্ষেত্রর কাছাকাছি বেলুড়ে এসে পড়া। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস থেকে বেলুড়ে থাকা, বরাবরের জন্য শুরু হয়। তখন আমার বড় ছেলের বয়স মাত্র তিন মাস। বালিগঞ্জে প্রথম পরিচয়, সেখান থেকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আঁটপুর ,আঁটপুর থেকে বেলুড়। তখন রেল কোম্পানির করণিক, সামান্য মাইনে কোন রকমে দিন গুজরান । বাড়ি ভাড়ার যোগান দিয়ে সংসার প্রতিপালন করাই দুঃসহ বিষয় ছিল । কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমি যার হাত ধরে ছিলাম তিনি একেবারেই শ্রমবিমুখ ছিলেন না। শ্রমের কথা জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতেন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি তার মননে স্থান পায়। ভোর সকাল থেকেই উদয়াস্ত পরিশ্রম, এমনকি বালিগঞ্জে যেতে হত বেলুড় থেকে টিউশনি করতে, তারপর ফিরে এসে কোনরকমে গোগ্রাসে গিলে নিয়ে অফিস যাওয়া। অফিসে উনি ছিলেন একাগ্র, সৎ কর্মী। অফিস থেকে ফিরে এসে সাড়ে ছটা সাতটা থেকে টিউশনি। ছোট্ট বাপি মানে বড় ছেলে তখন কোলে। আমার পক্ষে সব কিছু সামলানো সম্ভব হতো না যদি সেই সময় শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রিটের ভট্টাচার্জী পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতা না পেতাম। তিন ভাই ,বোন, মা নিয়ে ভটচাজ পরিবার যারা আমার ছোট্ট বাপিকে নিজেদের সন্তান হিসেবেই দেখভাল করত। তারপর ওদের বাড়িতে প্রথম দুই বউ এসে গেল যারা পিঠাপিঠি বোন। আমার ছোট্ট বাপির কোন আদরের অভাব হয়নি সেখানে। আর আমিও খুব সহজেই সংসার পালন করতে পেরেছিলাম ।

তারপর উত্তাল সেই সময় ১৯৬৭ এসে দুয়ারে হাজির, বেলুড়ে যার প্রভাব পড়েছিল ভীষণভাবে। বলা যায় এই উত্তাল সময় বেলুড়ে মানুষের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটায়।সময় এগিয়ে চলে তরঙ্গের মতো মিলিয়ে যায়। ততদিনে আমার বড় ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়ে কাটিয়ে ফেলেছে দু -এক বছর। বদমাইশ বিচ্ছুটা বেড়ে চলেছে নিজের মত সমাজে সবার সঙ্গে মিশে সবার মতো হয়ে। খুব ছোটবেলা থেকেই ও ওর বাবাকে হিরো মনে করত। আর আমি ওর মা হাজার চুরাশির না হলেও গোটা কতক পোলাপানকে মা এর স্নেহ দিয়ে বড় করেছিলাম। কখনো বাড়ি থেকে ওর ওপর ঠিক করে দেওয়া হয়নি সমাজে ওর মেলামেশার গন্ডি। ছেলেকে নিয়ে মাসে একবার করে উনি যেতেন আঁটপুর নিজের দেশ গ্রামে। বাড়িওয়ালার অসন্তোষ থেকে বাঁচতে হঠাৎ করে রেলওয়ে কোয়াটার নিয়ে চলে যাওয়া লিলুয়া। কিছুতেই

ছেলে যাবেনা তার ছোটবেলার সঙ্গ ছেড়ে। ওর প্রানের বন্ধু টুলটুল ও হাজির হয় ছেলের সাথে নতুন আস্তানায় । ততদিনে 70 দশকের আন্দোলন থেমে যাবার মুখে। সত্তর দশকের উচ্ছিষ্ট কিছু লুম্পেন সমাজে ছড়ি ঘোরানোয় ব্যাস্ত। যেন তারাই সমাজের মাথা। নতুন জায়গা সেই অঞ্চলের এই সমস্ত মানুষজন কে.বি. মিত্র কে চেনে না। তাই শুরু হয় তাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের দ্বন্দ্ব। ভীষণ এই একরোখা মানুষটাকে সামলানো দায়। জীবনে কারো সামনে অন্যায় মাথানত করতে দেখে নি ওকে। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, এটা তার সত্তর দশকের শিক্ষা। এই সমস্ত লুম্পেনদের ওনার কাছে শেষমেষ মাথানত করতে হয়েছিল। এই আবহে বেড়ে উঠেছিল বড় ছেলে তার শৈশব নিয়ে।

আমার কোলে দ্বিতীয় সন্তান আসে বাহাত্তরের এপ্রিল মাসে। পঁচাত্তরে এসে যায় রেল আন্দোলন ধর্মঘট। রেল কোয়ার্টারে থাকার দরুন সামনে থেকে দেখতে পাওয়া গেছিল রেল আন্দোলন, যেখানে একটিভ পার্টিসিপেশন ছিল ওনার। উনি প্রথম জীবনে দানাপুর এ পোস্টিং ছিলেন। সেখানকার বন্ধু কেষ্ট বাবু ছিল ওনার খুব ঘনিষ্ঠ। মানসিকতায় উনি এতই যৌথ ছিলেন কেষ্ট বাবুর ছেলেকে এখানে বাড়িতে রেখে উনি পড়ানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমার সন্তানদের যৌথতা সম্ভবত এই জীবনচর্চার ফলশ্রুতি। আমাদের দুজনের জীবন কি রকম ছিল সেটা বলা হয়নি। স্বামী হিসেবে ওনাকে পাওয়া একজন স্ত্রীর ভাগ্য কারণ উনি যে শ্রম চর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তা গৃহকর্মে ও একই রকম ছিল। তাই ঘরের খুঁটিনাটি সবকিছু নখদর্পণে থাকতো এবং ঘরটাকে মন্দিরের মতো পালন করেছিলেন। কোন কাজ ওনার চোখে ছোট ছিল না। সব সময় সমস্ত কাজ একাউন্টেন্টের নজরে দেখতেন। উনি বলতেন যে আমি রেল কোম্পানির একাউন্টেট আমার চোখে কিছুই ফাঁকি পড়ে না।

এবার ঘর ছেড়ে বাইরের পথে হাঁটাদিই একটু, আসলে ওনার জীবনটা বাইরেও একই রকম ছিল । ইস্টার্ন রেলওয়ে একাউন্ট রিক্রিয়েসান ক্লাবের দীর্ঘদিনের সম্পাদক ছিলেন। ভীষণভাবে নাট্যচর্চা করতে ভালোবাসতেন। বিখ্যাত নট জহর রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, ঠাকুরদাস মিত্রর সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ এসেছিল ওনার। স্ত্রী হিসেবে সেখানে আমার দায়িত্ব বেড়ে যেত । রিহার্সাল, গেট টুগেদার সবই আমাদের বাড়িতে হত। এই ভাবেই যৌথতার বন্ধনে সমাজের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলাম আমরা। উনি শিক্ষক হিসেবে বেলুড়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সারা পৃথিবী যখন সেরা ছাত্রদের বাছাই করে লেখাপড়া শেখাতে ব্যস্ত। উনি তখন পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সন্তানদের শিক্ষক। ওনার ছাত্ররা সব সময় ওনাকে ঈশ্বরতুল্য মনে করতেন।

এমনকি প্রতিষ্টিত স্কুল শিক্ষকরা ওনার কাছে আবদার নিয়ে আসতেন তার মেয়েকে ইংরেজি অংক করার জন্য। নাটক করবার কারনে ওনার আবৃত্তির করার অভ্যাস ছিল। উনি নৈবেদ্য কবিতার একটা লাইন মাঝে মাঝে বলে যেতেন ‘সকল গর্ব দূর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না।’ এ যেন ওনার উদ্দেশ্যে আমার না বলা কথা।

আমার মা শ্রীমতি ইন্দুমতী রায়চৌধুরী ছিলেন এক অনন্য মহিলা, যিনি কম বয়সে আমার বাবা মারা যাওয়ার দুঃখ কে দূরে ঠেলে দিয়ে পাঁচ ছেলে, মেয়েকে বড় করেছেন তুলেছিলেন পরিশ্রম এবং মেধার সাহায্যে। তার জীবনের পরিশ্রম এবং লড়াই দিয়ে তিনি পছন্দ করে নিয়েছিলেন তার বড় জামাইকে। যিনি মায়ের শেষ জীবন পর্যন্ত মায়ের সকল লড়াইয়ের সাথী কমরেড ছিল।এরপর ধীরে সংসারে স্বাচ্ছন্দ বাড়তে থাকে। দুজনের মিলিত সিদ্ধান্তে উনি বেলুড়ে জমি কিনে বাড়ি করে বরাবরের জন্য বসবাসের নিমিত্ত। বড় ছেলে সরকারি সংস্থায় চাকরি পেয়ে যায়। এতে ওনার নির্ভরতা বাড়ে হাত দিয়ে ফেলেন বাড়ি তৈরীর কাজে। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সেই বাড়ি নির্মাণ করেন তিনি। এই বাড়ি ঘিরে ওনার যে কত স্বপ্ন ছিল, প্রত্যেক টা ইট যেন ওর বুকের পাঁজর ছিল। বাড়ি তৈরীর সময় উনি ভিত পূজা করেননি। একজন জানতে চেয়েছিলাম যে আপনি কেন ভিত পুজো করেননি । তার উত্তরে উনি বলেন যে আমি চুরিও করিনা পুজোও করি না। এমনই স্পষ্টবক্তা ছিলেন উনি ওনার এই উত্তরে এলাকার ত্রাস সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন ।

জীবনের নিশ্চয়তা কে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে নিজের ছেলেদের ওপর উনি খুব নজর দিতে পারেননি। নিজের ছেলেরা নিজের মতোই বেড়ে উঠছিল ।শুধু ওনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর ছাপ পড়েছিল ছেলেদের মধ্যে। তারপর একে একে ঘরে বড় বউ আসে, জন্মগ্রহণ করে বড় নাতি। যাকে আদর করে ডাকতেন বন্নু দাদা বলে। বন্নু মানে বদমাইশ দাদা। এই প্রথম এই বাড়ির কোন সন্তান সম্পূর্ণ ওনার মানসিক শারীরিক সাহচর্যে বেড়ে ওঠে। উনি নিজের জীবনের সমস্ত কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন নাতিকে বড় করতে। এমন কি দাদার সঙ্গে সিগারেট খেতে হবে নাতিকে । সেই সময় আমাদের পারিবারিক বন্ধু শৈল সাধন সরকার নিয়মিত আসতেন আমাদের বাড়িতে চলত তিনজনে মিলে সিগারেট খাওয়ার পালা। দুজন প্রকৃত সিগারেট খেতেন আরেকজন কে পাকিয়ে নকল সিগারেট দেওয়া হত না হলেই গোঁসা । আমাদের পারিবারিক বেড়াতে যাবার ট্যুরে শৈল বাবু ছাড়াও ছেলেদের বন্ধুবান্ধব বহু মানুষ যুক্ত ছিল। সে এক রঙের বর্ণালী যেন। এরপর ছোট ছেলের চাকরি তার ত্রিপুরা চলে যাওয়া । তারপর বিয়ে, দুই সন্তানের

জন্ম নেওয়া । এই ভাবে এগোচ্ছিল দিনগুলো । ত্রিপুরায় গিয়ে আমরা দুজনে ওদের সংসারকে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিভাবে যে কেটে গেল এত বড় জীবন মুহূর্তে বুঝতেই পারলাম না ।

কেউ কথা রাখেনি !!

উনি কথা দিয়েছিলেন আমায়, আমায় মেরে উনি মরবেন। বলেছিলেন তুমি আমার পেনশন ভোগ করবে এমনটা হতে দেবো না। ওনার বেঁচে থাকার বড় সাধ ছিল। আপন ঘরের কোণে ভীষণভাবে আত্মস্থ হয়ে উনি বেঁচে থাকতে ভালোবাসতেন । জীবনের শেষ সীমায় এসে নিজের প্রতিটি কাজ নিজে করতে চেষ্টা করতেন। নিজের জীবন পরিবার এই বাড়িটা কে আঁকড়ে ধরে উনি বেঁচে ছিলেন। যেদিন উনি প্রথম চেক আপ এ গেলেন সেদিন নিজের রক্তাক্ত প্যান্ট কে জলে ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এই আশায় যে উনি ফিরে এসে কেচে পরিষ্কার করে দেবেন। ওর এই শেষ আশা টি পূরণ হয়নি।অপারেশন করার পর ওনার শরীর খারাপ হয়ে যেতে থাকে আমি বাইরে থেকে বুঝতে পারতাম না কারণ ছেলেরা ভরসা যোগাতে সব সময় ঠিক রিপোর্ট জানতে দিতনা ।আমি মনে মনে কামনা করতাম যেন পড়ো হয়ে উনি বেঁচে না থাকেন । ওর মতো ঋজু চরিত্রের মানুষকে আমি পড়ে থাকতে দেখতে পারবো না। ফিরে আসার পর আমার মনে আবার নতুন করে ওঁর বেঁচে ওঠার আশা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উনি আর হয়তো বাঁচবেন না। তাই প্রাণভরে দেখতে চাইছিলেন সকলকে, আমাদের বলতে চাইছিলেন যে কিভাবে ভবিষ্যৎ সময়টা তোমরা কাটাবে। কেমন ভাবে উনি সব গুছিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজের অটুট বিশ্বাস কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গেছিলো। উনি উঠতে চেস্টা করছিলেন বারবার, অপারগ হয়ে শেষমেশ শুয়ে পড়লেন ,আর উঠলেন না । আমার পাশে শুয়ে শুয়ে আমার হাতে জল খেতে খেতে উনি হঠাৎই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অশেষ দুঃখের মধ্যে আমাকে শান্তি দিয়ে গেলেন কারও ভরসায় ওঁকে বেঁচে থাকতে হল না। আমার কাছে এই যাওয়া মহাপ্রস্থানের অন্য নাম।